কামাখ্যাতলা আশ্রমের ইতিবৃত্তি

বিষয়বস্তুর সারণী

কামাখ্যাতলা আখড়ার সূচনা -

শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব ভাবধারার মিলনভূমি মুর্শিদাবাদ জেলা। জেলার নানান প্রান্তে ছড়িয়ে আছে রাধা কৃষ্ণ মন্দির , গৌরাঙ্গ -গোবিন্দ মন্দির, শিব মন্দির, কালী মন্দির, সমাধি মন্দির বা সাধু বৈষ্ণব আখড়া।সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার আখড়া আজও খুঁজলে মিলবে।যেখানে হরিনামে আত্মমগ্ন ভক্ত খুঁজে পায় নবজীবনের সন্ধান। তারই মধ্যে পবিত্র শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব তীর্থভূমি রূপে যেখানে দেশ-বিদেশের ভক্ত এসে এই মাটিতে মাথা ঠেকায় তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-মুর্শিদাবাদ জেলার বরানগরে ভবানীশ্বর মন্দির অবস্থিত যেটি পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় গুরুত্বের স্মৃতিস্তম্ভের তালিকায় রয়েছে।ঐতিহাসিক কিরীটেশ্বরী মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রামের অধীনে কিরীটকোনা গ্রামে অবস্থিত। ৫১ টি পিঠে এটি সতী পীঠগুলির মধ্যে একটি।সেপ্টেম্বর ,২০২৩ সালে এই এলাকাটি ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল।পবিত্র দেবী গঙ্গার শাখা ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে জেলাকে দুভাগে ভাগ করেছে। নদীর পশ্চিমের অংশ রাঢ় অঞ্চল ও পূর্বের অংশ বাগড়ি অঞ্চল।এই দুই অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য হিন্দু মন্দির অবস্থিত উল্লেখযোগ্য আরোও কয়েকটি হলো হল - শ্রীপাট ভারতপুর , শ্রীপাট কাঞ্চনগড়িয়া , শ্রীপাট মানিক্যাহার , কান্দি রাধাবল্লভ মন্দির,তিলিপাড়া কামাখ্যাতলা আশ্রম, দক্ষিণাকালী মন্দির-দোহালিয়া,শিকল কালী মন্দির- লালগোলা,পঞ্চরত্ন বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির,জোড়া শিব মন্দির,পঞ্চরত্ন রত্নেশ্বর শিব মন্দির,যুগওয়ারায় শিব মন্দির,মুকুটেশ্বর শিব মন্দির,মা নাককাটি মন্দির ,দশ শিব মন্দির-কাশিমবাজার,নৃসিংহদেব মন্দির।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের প্রথম থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। শ্রীচৈতন্য রাঢ় পরিভ্রমণকালে কান্দি অঞ্চলের সাটুই, শক্তিপুর,আলুগ্রাম, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরেরা এখনও বাস করেন। মালিহাটি, মানিক্যহার, সোমপাড়া, দক্ষিণখণ্ড, বুধুইপাড়া ইত্যাদি এঁদের আবাসস্থলগুলি বৈষ্ণবচর্চার কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। চৈতন্যচরিতামৃতকার পদকর্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ, নৃসিংহ কবিরাজ ও বিশ্বনাথ কবিরাজ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে জেলার বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বিগ্রহ, তাঁদের আবির্ভাব, তিরোভাব উৎসব এ-জেলার মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পার্বণ। অনেক শ্রীপাট এখন বিলুপ্তির পথে। তবে কিছু শ্রীপাট এখনও এ-জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রকে সজীব রেখেছে। গদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ (বাণীনাথ) মিশ্রের পুত্র নয়নানন্দের বংশধরগণ এখনও মুর্শিদাবাদের শ্রীপাট ভারতপুর , ভারতপুরে থাকেন। সালারের স্টেশনের কাছে ঝামটপুর বহারানে চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে দ্বিজ হরিদাসের শ্রীপাট , ভগবানগোলার কাছে বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের শ্রীপাট , তেলিয়া বুধুরিতে রামচন্দ্র কবিরাজের শ্রীপাট আছে।তেলিয়া বুধুরিতে আরও অনেক বৈষ্ণব সাধক বসবাস করতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের রামকেলি যাত্রা মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর সেখান থেকে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে গদাধর পণ্ডিতের বাড়িতে আসেন। সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ এবং কেশব ভারতী। গদাধর পণ্ডিতের বংশধরদের গৃহে এখনও একটি গীতা আছে যেটি গদাধর পণ্ডিতের নিজের হাতে লেখা। এই গীতার পাণ্ডুলিপিতে শ্রীচৈতন্যদেবের লেখা তিন লাইনের একটি টীকা এবং তাঁর স্বাক্ষরও রয়েছে। রামকেলি পৌঁছনোর (১৫০৭-০৮) পূর্বে শ্রীচৈতন্য মুর্শিদাবাদের কান্দি, সৈদাবাদ, বুধুইপাড়া, গাম্ভিলা (জিয়াগঞ্জ), কিরীটেশ্বরী, তেলিয়া বুধুরি প্রভৃতি জায়গায় যান। ১৫১৫ সালে শ্রীচৈতন্যদেব দ্বিতীয়বার মুর্শিদাবাদে আসেন এবং বিভিন্ন শ্রীপাট পরিদর্শন করেন। অনেকের মতে ১৫০৭ নয়, ১৫১৫ সালে সুলতান হুসেন শাহের সময় তিনি রামকেলি যান; সেই সময়েই হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ ও সনাতন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই জেলার বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন নামেএই জেলার বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোনও কোনও কেন্দ্রকে আখড়া বলা হয়, যেখানে সন্ন্যাসী সৈন্যরা নিয়মিত ডন বৈঠক করতেন, কুস্তি লড়তেন। বৈষ্ণব গুরুর জন্মস্থান 'ধাম', একাধিক বৈষ্ণব গুরুর মিলনক্ষেত্র 'মহাপাট' নামে পরিচিত। গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব নিদর্শন যথা মহাপ্রভুর হাতে লেখা পুঁথি বা স্মারক যেখানে আছে সেটি 'শ্রীপাট''। এই কেন্দ্রগুলি কেবলমাত্র ধর্মীয় জীবনই নয়, সমাজজীবনকেও অপরিসীম প্রভাবিত করেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে এদের যোগ। নবাব, জমিদার ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিম্ন শ্রেণির হিন্দু, মুসলমান সকলেই বৈষ্ণব গুরুদের দ্বারা প্রভাবিত। নবাব, জমিদাররা পৃষ্ঠপোষকতা করে জেলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

বৈষ্ণব আখড়াগুলি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত হত। তৎকালীন সমাজজীবনের অনেক চাহিদা তারা পূরণ করেছিল। গরিব-দুঃস্থদের সেবা ছিল তাদের প্রধান কাজ। আখড়ার মাধ্যমে কেউ কেউ টোল-বিদ্যালয় খুলতেন, কেউ ডাকঘরের জন্য পাকা ঘর ও জমি দান করতেন। কেউ আবার সহায়হীনদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেন।ষোলো-সতেরো শতকে মুর্শিদাবাদে কয়েকটি বৈষ্ণব কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই সংখ্যা আঠারো ও উনিশ শতকে বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রশাসনের গুরুত্ব এই সংখ্যাবৃদ্ধির একটি কারণ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছিল বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে। নিত্যানন্দের প্রেরণায় গোয়ালা সমাজ এবং সুবর্ণবণিক সমাজ দীক্ষা নেয় বৈষ্ণব ধর্মে। সুবর্ণবণিকরা ফিরে পায় হারানো মর্যাদা, যা তারা বল্লাল সেনের সমাজ সংস্কারের ফলে হারিয়েছিল। রাজশাহীর কায়স্থ নরোত্তম দত্ত বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিলে তাঁর প্রভাবে কায়স্থরাও দীক্ষিত হয়। মুসলমানদের অধীনে কাজ করার জন্য জাতিচ্যুত হয়েছিলেন রূপ ও সনাতন; তাঁরাও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ফিরে পান হারানো সম্মান। গরিব ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণব সমাজে অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা পায়। ব্যবসায়ে যুক্ত থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয় এবং সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করে। বর্ণসংকররাও এই ধর্মে যোগ দেয়। বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন উৎসব- অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেসব মেলা হত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে, সেগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। মেলাগুলির আয়োজন বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলির বৈভব, সামাজিক মর্যাদা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রমাণ। এইসব মেলায় হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোক মিলিত হত, এখনও হয়। ধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে এই মেলাগুলি সামাজিক মিলনক্ষেত্র। অর্থনৈতিক লেনদেনেও মেলাগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় বা সমস্ত জেলা থেকেই কারিগরেরা তাদের পসরা নিয়ে মেলায় আসে, জেলার বাইরে থেকেও মানুষ আসে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে এই মেলাগুলির ভূমিকা লক্ষণীয়।

'আখড়া' শব্দের বাংলা অর্থ আধ্যাত্মিক অনুশীলনের স্থান।ইহা সাধু পুরুষ বা গুরু, গোসাঁইদের সমাধির উপর নির্মিত হয়। আখড়াতে সাধুসন্তদের সেবা করার জন্য ভক্তরা সবসময় জড় হয়। তারা কোন নির্দিষ্ট আরাধ্য দেবতাকে সেখানে সেবা অর্চনা করে থাকে। বাংলাদেশ তথা ভারতের অনেক অঞ্চলে জগন্মোহনী বাউল মতবাদ (জগন্মোহন গোসাঁই নামীয় একজন বাউল সাধক কর্তৃক এই মতবাদের উৎপত্তি ঘটে বলে একে "জগন্মোহনী বাউল মতবাদ" বলে অভিহিত করা হয়। তিনি উৎকলের(উড়িষ্যা) একজন রামানন্দী (রামানন্দ) বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা লইয়া ভেক ধারণ করেন। জগন্মোহনের শিষ্য গোবিন্দ গোসাঁই,তার শিষ্য শান্ত গোসাঁই,শান্তের শিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঁই। জগন্মোহনী বাউল ভক্তদের হিসাব অনুসারে হাজার-হাজার লোক এই সম্প্রদায়ে সন্নিবিষ্ট আছে।) এর বৈষ্ণবদের হাজার হাজার আখড়া বিদ্যমান আছে, তারা সেখানে গুরু পরম্পরা গোসাঁইগণের সেবা অর্চনা করে থাকে।মুর্শিদাবাদ জুড়েই রয়েছে এমন অনেক আখড়া । মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর থানার অন্তর্গত কামনগর কামাখ্যাতলা আখড়া অন্যতম।যেটি বর্তমানে তিলিপাড়া কামাখ্যাতলা আখড়া বা কামাখ্যাতলা আশ্রম নামে সুপরিচিত। কামাখ্যাতলা আশ্রম নামটি ইদানিং ব্যবহার করা হলেও ঐতিহাসিক ভাবেই এটি কামাখ্যাতলা আখড়া নামেই পরিচিত। আখড়াটি যেখানে অবস্থিত সেই গ্রামের নাম কামনগর।কামনগর শব্দের অর্থ হলো, কামনার স্থান। 'কাম' শব্দের অর্থ হল - কামনা, বাসনা, অভিলাষ, অনুরাগ, যৌন সম্ভোগের ইচ্ছা, লাস্য, লালসা, লিপ্সা। কাম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে: যৌনসঙ্গমের জন্য কাম, জ্ঞানের জন্য কাম, শক্তির জন্য কাম, লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাম।'নগর' শব্দের অর্থ হল গঞ্জ , শহর-বলতে এক নির্দিষ্ট আকারের মানব বসতিকে বোঝায়।।নগর শব্দের উৎপত্তি 'নগ' শব্দ থেকে। 'নগ' শব্দের অর্থ পাহাড় বা পর্বত। নগর শব্দের উৎপত্তির কারণ হল, নগরে ঘন বসতি থাকে এবং ঘর-বাড়ি পাহাড়ের মতো উঁচু হয়।

'কামাখ্যা' শব্দের অর্থ হল, 'তিনি যিনি ইচ্ছা পূরণ করেন'। কামাখ্যা একজন মাতৃদেবী এবং শাক্ত তান্ত্রিক দেবী। তাকে কামনার দেবী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই গ্রামটির প্রাচীন নাম 'কামনগর' গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাখ্যার নাম অনুসারেই সে বিষয়ে জনশ্রুতি রয়েছে।

কামাখ্যাতলা আখড়ার কামাখ্যা মায়ের ইতিহাস-

শক্তিপীঠগুলি উপমহাদেশে অনেক আগে থেকেই আছে, এগুলি হরপ্পা সভ্যতার তন্ত্রাশ্রয়ী মাতৃধর্মের উত্তরাধিকার। শক্তিপীঠ কিরীটেশ্বরী, মুর্শিদাবাদ জেলার একটি সুপ্রাচীন মাতৃমন্দির।কামাখ্যা মন্দিরে মতোই মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী মন্দিরে তন্ত্রসাধনা করা হয়। এই শক্তিপীঠে রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ রায় পঞ্চমুণ্ডি আসনে তন্ত্রসাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।মধ্যযুগে উল্লেখ: মোগল আমলের একটি নথিতে একে ভবানী স্থান বলা হয়েছে। রিয়াজ উস সালাতিন কিরীটকোণা গ্রামের উল্লেখ করেছে কিছুটা ভিন্ন বানানে। মহানীলতন্ত্রে কিরীট তীর্থ এবং কিরীটেশ্বরী মায়ের উল্লেখ আছে। দেবী ভাগবতে মুকুটেশ্বরী নামটি পাওয়া যায়। তাই শোনা যায় তন্ত্র সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ ভূমি এই শক্তিপীঠ। অতীতে অংসংখ্য তান্ত্রিক , সন্ন্যাসী কিরীটেশ্বরী মন্দিরে তন্ত্র সাধনা করেছেন।কামরূপ - কামাখ্যা থেকেও সিদ্ধ কিংবা সাধনার জন্য অনেক সাধু, সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক মুর্শিদাবাদে আসেন। ভাগীরথীর পশ্চিম প্রান্তের নদীর তীরে কিরীটেশ্বরী থেকে মাত্র ২৩ কিলোমিটার দূরে পঞ্চমুণ্ডি আসনে তন্ত্রসাধনা করে সিদ্ধিলাভ করার জন্য কামনগর কামাখ্যা মন্দিরে দেবী কামাখ্যার শিলা মূর্তি স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে কোনো এক সাধক বা সাধকগণ।এই বিষয়ে কোনো প্রমাণ না থাকলেও প্রাচীন শিলা মূর্তি , প্রাচীন সিদ্ধ বকুল ও তামাল গাছ , মাধবী লতার জট, মন্দিরের নতুন ঘর তৈরির সময় খুঁজে পাওয়া পঞ্চ মুন্ডির আসন তথা বহু প্রাচীন মানব মুন্ডু , দীর্ঘকায় দেহ কঙ্কাল , সর্বোপরি তন্ত্রসাধনা বা কালো জাদুর মন্ত্র তন্ত্র মেনেই এখনো দৈনন্দিন চলছে রুগী সুস্থতার কাজ বিশেষ করে শনিবার ও মঙ্গল বার দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন বহু ভক্ত, দেবী কামাখ্যার সাধন মন্ত্রে নিরাময় পাওয়ার জন্য। তাই জনশ্রুতি রয়েছে কামরূপ কামাখ্যা মায়ের তন্ত্রসাধকদের দ্বারা এই কামাখ্যা মায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শোনা যায় বহু তান্ত্রিক এবং সাধকগণ তান্ত্রিকঃ আখড়া হিসেবেও ব্যবহার করতেন।যদিও গভীর জঙ্গলে ঘেরা ছিলো এই দেবী কামাখ্যার আখড়া।বাঘ, ভাল্লুক , হাতি ও অংসখ্য হিংস্র জীব জন্তুর বাস ছিল আখড়া। আজ থেকে দুশো বছর আগেও এই আখড়া গভীর জঙ্গলে অবস্থান ছিল যেখানে স্বচোখে অনেকেই বাঘ দেখেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়: কামাখ্যাতলা আখড়ার জনশ্রুতি ও সাধকগণ –

পঞ্চ পাণ্ডবের চরণধূলি : পুরাণ বলছে, এ বঙ্গ ‘পাণ্ডববর্জিত। অর্থাৎ, এখানে কখনও পাণ্ডবদের পা পড়েনি। কিন্তু, বাঁধা ছাঁদের বাইরে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনার মধ্যে দিয়ে যে গল্পকথা এগিয়ে চলে তাতে অনেক অঘটনও কখন যেন সত্যি হয়ে ওঠে। বীরভূম জেলার পাণ্ডবেশ্বরে এসে পঞ্চপাণ্ডব ও মাতা কুন্তীর ছটি শিবলিঙ্গ স্থাপনও তেমনই এক ‘সত্যি। কবে, কখন এই লোকশ্রুতি চলতে শুরু করেছিল, আজ আর তার হদিস মেলে না।জনশ্রুতি, অজ্ঞাতবাসের সময়ে মাতা কুন্তীকে নিয়ে এক সময়ে অজয় নদের ধারে আশ্রয় নিয়েছিলেন পাঁচ ভাই। পাশাপাশি একটি করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতেন তাঁরা। অজয়ের পাশে তা-ই এখন পাণ্ডব মুনির আশ্রম হিসেবে পরিচিত।

আবার এই বাংলার দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরের হাতিডুবা গ্রামে রয়েছে শমী বৃক্ষ। কথিত রয়েছে, মহাভারতের বিরাটপর্বে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় ছদ্মবেশ নিতে গিয়ে নিজেদের অস্ত্রগুলো এই বৃক্ষের কোটরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই শমী বৃক্ষ সেই মহাভারতের যুগ থেকে এখনও বর্তমান। এই বৃক্ষস্থল বর্তমানে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছ।পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাস নেওয়ার জন্য দিনাজপুরের হরিরামপুরের হাতিডুবা গ্রামে পৌঁছানোর আগেই ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ঘন জঙ্গলে ঘেরা কামাখ্যাতলা আখড়ায় বেশ কিছু সময় কাটিয়েছিলেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে এই কামাখ্যাতলা আখড়াকে কেন্দ্র করে।

মহাপ্রভুর চরণ ধুলি : কামাখ্যাতলা আখড়া থেকে পশ্চিমে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থান শ্রীল গদাধর পন্ডিতের শ্রীপাট ভরতপুর।মাত্র ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর বাড়ি , শ্রীপাট মাণিক্যহার এবং পশ্চিমে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে দ্বিজ হরিদাসের শ্রীপাট কাঞ্চন গড়িয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের রামকেলি যাত্রা মুর্শিদাবাদে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। জনশ্রুতি রয়েছে সেই সময় মহাপ্রভু পরিজন সহ এই আখড়ায় এক রাতি বাস করেছিলেন স্বপাক রান্না করে সকলে প্রসাদ পেয়েছিলেন।প্রসঙ্গত এই আখড়ার সংলগ্ন গ্রাম সাটুই এবং চৌরীগাছাতে মহাপ্রভুর মন্দির রয়েছে যে গুলি বহু প্রাচীন মন্দির এবং সকলে জানেন মহাপ্রভু পারিষদবর্গ নিয়ে রামকেলি যাত্রা কালে এই সকল মন্দির গুলির কোথাও নিশি যাপন এবং কোথাও মধ্যাহ্নভোজন করেছিলেন।